

ব্রাম স্টোকারের ১৬৫তম জন্মদিনে বঙ্গভারতীর বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য

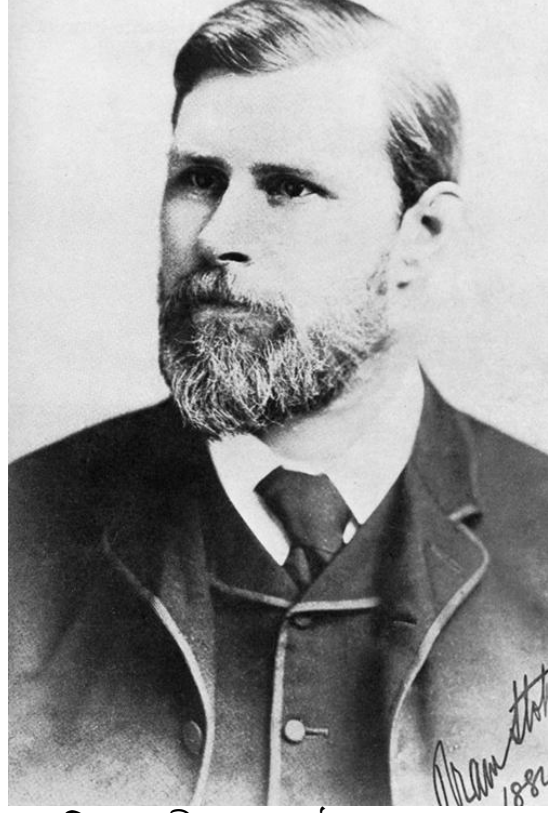
ড্রাকুলার অতিথি



ব্রাম স্টোকার
অনুবাদ: অর্ণব দত্ত

ব্রাম স্টোকার

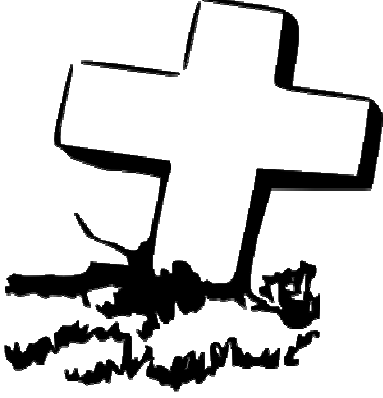
১৮৪৭ সালের ৮ নভেম্বর
আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্ম
ব্রিটিশ লেখক ব্রাম স্টোকারের।
বাবা আব্রাহাম স্টোকার ও মা
শার্লট মাথিল্ডা ব্লেক খরনলে।
ডাবলিনেই একটি বেসরকারি স্কুলে
লেখাপড়ার শুরু। ছেলেবেলা
থেকেই ছিলেন চুপচাপ প্রকৃতির।
মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সেই সঙ্গে
খেলাধুলাতেও বেশ নামডাক ছিল।
ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে
গণিতে সাম্মানিক সহ স্নাতক হন।
কিন্তু ছাত্রাবস্থাতেই আকৃষ্ট হন
থিয়েটারের প্রতি। তাই তাঁর
কর্মজীবনও শুরু হয় নাট্য



সমালোচক হিসেবে। পরে শিল্পকলার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। চলে আসেন
নাট্যপ্রযোজনার জগতেও। এই সময় পূর্ব ইউরোপ আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
ভ্রমণ করেন। আর এই নাট্যপ্রযোজনার সময় থেকেই তাঁর কথাসাহিত্যিক
রূপে আত্মপ্রকাশ। প্রথম উপন্যাস *দ্য স্কেকস পাস* (১৮৯০)। পরের
উপন্যাস *ড্রাকুলা* (১৮৯৭) তাঁকে এনে দেয় জগতজোড়া খ্যাতি। এর পরেও
लिখেছিলেন *দ্য লেডি অফ দ্য শ্রাউড* (১৯০৯), *দ্য লেয়ার অফ দ্য হোয়াইট
ওয়ার্ম* (১৯১১) ইত্যাদি বেশ কিছু ভৌতিক উপন্যাস ও গল্প। ১৯১২ সালের
২০ এপ্রিল লন্ডনে মৃত্যু হয় স্টোকারের। তাঁর দেহ দাহ করা হয়েছিল।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অনূদিত গল্পটি ১৯১৪ সালে মরণোত্তর প্রকাশিত *ড্রাকুলা জ গেস্ট অ্যান্ড
আদার উইয়র্ড স্টোরিজ* গল্পসংকলনের প্রথম গল্প। ব্রাম স্টোকারের
১৬৫তম জন্মদিনে এই প্রসিদ্ধ গল্পটি পিডিএফ বুকলেট আকারে প্রকাশ
করা হল।



যাত্রা শুরুর সময়ও মিউনিখের আকাশে জ্বল জ্বল করছিল মধ্যাহ্নসূর্য। বাতাসে নববসন্তের উচ্ছ্বাস। রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হের ডেলব্রুক (যে হোটেলে উঠেছিলাম, তার মালিক) নগ্নশিরেই ছুটে এলেন আমাদের গাড়ি অবধি। আমাকে শুভ যাত্রা জানিয়ে গাড়ির দরজার হাতলে হাত রেখে কোচোয়ানকে বললেন, “রাত পড়ার আগেই ফিরে আসিস কিন্তু। আকাশটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু উত্তুরে হাওয়ায় একটা কাঁপুনিও লাগছে। মনে হচ্ছে, ঝড় উঠবে। তাই, দেরি করিসনি।” তারপর একটু হেসে বললেন, “আজকের রাতটা খেয়াল আছে তো!”

জোহান দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলে, “Ja, mein Herr.” (“হ্যাঁ, কর্তা।”) তারপর নিজের টুপিটা চেপে ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওকে থামতে নির্দেশ করলুম। জিজ্ঞাসা করলুম:

“আজকের রাত্তিরটা কি হে, জোহান?”

সে বুকে ক্রুস ঐঁকে ছোট করে জবাব দিলে: “Walpurgis nacht.” (“ওয়ালপারজিস রাত।”) তারপর টার্নিপের মতো দেখতে একটা সেকেলে জার্মান সিলভারের ঘড়ি বের করে সেটার দিকে তাকিয়ে খানিকটা অস্থিরভাবে কাঁধ নাচালে। বুঝলুম, আমার অকারণ সময় নষ্ট দেখে এটা তার সসম্মত প্রতিবাদ। তাই ফিরে এসে গাড়ি হাঁকাতে বললুম। সে-ও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এদিকে ঘোড়াগুলো মাঝেমধ্যেই মাথাঝাঁকানি দিয়ে উঠে খুব রহস্যজনকভাবে বাতাসে কি একটা শুকতে লাগল। আমিও ভয় পেয়ে আশেপাশে তাকাতে লাগলুম। রাস্তার ধারে

জনবসতি সেরকম ছিল না। জায়গাটা একধরনের বায়ুতাড়িত মালভূমির মতো। যেতে যেতে দেখলুম, পাশে একটা রাস্তা ঐক্যেঁকে নেমে গিয়েছে নিচের উপত্যকার দিকে। মনে হল, সেই রাস্তায় লোক-চলাচল বিশেষ হয় না। ভারি ভাল লাগল। কোচোয়ানকে বিরক্ত করে আরেকবার তাকে থামালুম। বললুম ওই রাস্তায় একটিবার যেতে। সে নানা ওজরআপত্তি তুলে বারবার বুকে ক্রুস আঁকতে লাগল। এতে আমার কৌতুহল গেল বেড়ে। তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলুম। সেও নাছোড়। বার বার ঘড়ি-দর্শন প্রতিবাদ চালিয়ে গেল।

শেষে বললুম, “আচ্ছা, জোহান, শোনো। আমি ওই রাস্তায় যাচ্ছি। তুমি যেতে না চাইলে তোমাকে জোরাজুরি করব না। কিন্তু কেন ওখানে যাবে না, সেটা তো বলবো।” এবার সে বক্স থেকে নেমে এল মাটিতে। হাতজোড় করে আমাকে সেখানে না যেতে অনুরোধ করতে লাগল। তার জার্মানের মধ্যে মোটামুটি ইংরেজি মেশানো ছিল, তাতে ওর কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সে আমাকে একটা কিছু বলতে চাইছিল—এমন একটা কিছু যা ওর কাছে খুবই ভয়ের ব্যাপার—কিন্তু প্রতিবারই ওই “Walpurgis nacht!” ছাড়া আর কিছুই বলে উঠতে পারছিল না সে।

ওর সঙ্গে খানিক তর্ক করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যার ভাষা জানি না, তার সঙ্গে তর্ক করা মুশকিল। ওর বরং একটু সুবিধেই হল। সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারত। কিন্তু তখন উত্তেজনার বশে মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। প্রত্যেকবার কথা বলতে বলতে সে ঘড়ি দেখছিল। তারপর ঘোড়াগুলোও অশান্ত হয়ে বাতাসে কি যেন ঝুঁকতে লাগল। তাতে সে আরও ভয় পেয়ে গেল। চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ সামনে দিকে লাফিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে তাদের প্রায় কুড়ি ফুট দূরে গিয়ে রাখল। আমি পিছন পিছন গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ও অমন করল কেন। জবাব দেওয়ার আগে সে একবার বুকে ক্রুস আঁকলে। তারপর গাড়িটা রাস্তার অন্য দিকে রাখতে রাখতে আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেই জায়গাটা দেখাল। তারপর চৌমাথাটা দেখিয়ে প্রথমে জার্মানে ও পরে ইংরেজিতে বলল, “নিজেকে মেরে ফেলেছিল... তাকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে।”

আত্মহত্যা! মনে পড়ল, আত্মহত্যাকারীদের রাস্তার চৌমাথায় কবর দেওয়ার প্রথা ছিল এক কালে। “ওহ্! তাই বলো, আত্মহত্যা। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!” অবশ্য মুখে যাই বলি, ঘোড়াগুলি কেন অমন করছিল, তা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না।

কথা বলতে বলতে কুকুরের কান্নার মতো একটা ডাক শুনতে পেলাম। দূর থেকে আসছিল আওয়াজটা। ঘোড়াগুলো তাতে খুব অশান্ত হয়ে উঠল। জোহান অনেক কষ্টে তাদের শান্ত করল। সে নিজেও ভয়ে কাঁঠ হয়ে গিয়েছিল। বলল, “নেকডের ডাক—অথচ এদিকে এখন নেকড়ে নেই।”

“নেই?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কিন্তু অনেক কাল আগে তো নেকডেরা শহরের কাছেই থাকত, তাই না?”

সে জবাব দিল, “অনেক অনেক আগে। তাও বসন্তে আর গ্রীষ্মের সময়। কিন্তু বরফের মরসুমে আসত না।”

ঘোড়াগুলির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে তাদের শান্ত করতে লাগল। আকাশে একটা কালো মেঘ দ্রুত এগিয়ে এল। রোদ পড়ল ঢাকা। একটুখানি ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগল। একটুখানিই। বোধহয় সতর্ক করে গেল। কারণ খানিক বাদেই আবার সূর্য মুখ দেখালেন।

জোহান দিগন্তের দিকে আঙুল তুলে বলল, “বরফের ঝড়... অনেক দিন আগে এসেছিল।” তারপর আর একবার ঘড়ি দেখল। লাগামটা শক্ত করে ধরে রইল। কারণ ঘোড়াগুলো মাটিতে খুরের আঘাত করতে করতে অস্থির হয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। এবার সে বক্সে উঠে গেল। বলতে চাইল, যাওয়ার সময় হয়েছে।

আমার ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগল। তখনই গাড়িতে চড়লুম না।

আমি রাস্তাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, “ওই রাস্তাটা কোথায় গেছে?”

সে আর একবার বুকে ত্রুস ঐঁকে খানিকটা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে বলল, “ওটা অপবিত্র।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কি অপবিত্র?”

“গ্রামটা।”

“ও! ওখানে গ্রাম আছে?”

“না না। ওখানে কয়েকশো বছর কেউ থাকে না।”

আমার কৌতুহল বেড়ে গেল, “তবে যে বললে ওখানে গ্রাম আছে।”

“ছিল।”

“এখন কোথায় গ্রামটা?”

জার্মান-ইংরেজি মিশিয়ে সে আমাকে একটা লম্বা গল্প শোনাতে শুরু করল। তার সবটা যদিও বোধগম্য হল না। শুধু এটুকু বুঝলুম, অনেকদিন আগে-মানে বেশ কয়েকশো বছর আগে-এখানে কিছু লোক মারা যায় এবং তাদের কবর দেওয়া হয়। কিন্তু মাটির তলা থেকে আশ্চর্য শব্দ শুনে গ্রামের লোকেরা কবর খুঁড়ে দেখে, সেখানে শায়িত নরনারীর দেহে হৃদয়ের স্পন্দন আর মুখে লাল রক্ত লেগে। দেখে তারা ভয় পেয়ে যায়। নিজেদের প্রাণ এবং অবশ্যই আত্মাকে বাঁচানোর জন্য (একথা বলে জোহান আর একবার বুকে ত্রুস আঁকল) তারা সবাই সেই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে এমন জায়গায় চলে যায় যেখানে জীবিতরা জীবিত আর মড়ারা মড়াই-অন্য কিছু না। শেষ কথাটা জোহান বেশ ভয়ে ভয়ে বললে। গল্পটা বলতে বলতে সে ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়ল। মনে হল যেন, কল্পনাই ভর করেছে তাকে। শেষকালটায় দেখি ভয়ে তার মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। ঘামতে ঘামতে আর কাঁপতে কাঁপতে চারপাশে এমন করে তাকাচ্ছে যেন এই প্রকাশ্য দিবালোকেই কোনো অশরীরী আতঙ্ক তার চারপাশে সে ঘুরতে দেখছে।

শেষকালে সে মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল “Walpurgis nacht!” বলেই আমাকে গাড়িতে ওঠার জন্য অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

এতে আমার ইংরেজ-রক্ত উঠল টগবগিয়ে ফুটে। পিছিয়ে এলুম। বললুম, “তুমি ভয় পাচ্ছ, জোহান-আচ্ছা, তাহলে বাড়ি ফিরে যাও। আমি একাই

ফিরব। একটু হাঁটাহাঁটি করা আমার পক্ষে ভালই।” গাড়ির দরজা খোলা ছিল। আমার ওক কাঠের লাঠিটা সিট থেকে বের করে নিলুম—ছুটিছাঁটায় হাঁটতে বেরোলে এই লাঠিটা সঙ্গে নিয়ে বের হই—তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে মিউনিখের দিকে নির্দেশ করে বললুম, “বাড়ি যাও, জোহান—ইংরেজ ওয়ালপারজিস রাতকে ডরায় না।”

ঘোড়াগুলি ততক্ষণে ভীষণই অশান্ত হয়ে উঠেছে। তাদের ধরে রাখার চেষ্টা করতে করতেই জোহান আমাকে মিনতি করে বলতে লাগল, বোকার মতো ও কাজ না করতে। বেচারিকে দেখে দয়া হচ্ছিল—কুসংস্কার তার মাথাটি খেয়ে বসেছিল। আবার না হেসেও পারছিলাম না। উত্তেজনার বশে সে ভুলেই গিয়েছিল যে, তার ভাষা আমি বুঝি না; সে ইংরেজি ছেড়ে কথ্য জার্মানেই বকবক করে যেতে লাগল। শেষটায় যখন আর সহ্য হল না তখন রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, “বাড়ি!” বলেই পিছন ফিরে চৌমাথায় নেমে উপত্যকার দিকে এগিয়ে চললাম।

অবশেষে সে হতাশ হয়ে গাড়ি ঘোরালো মিউনিখের দিকে। আমি লাঠিতে ভর দিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলাম। প্রথমটা সে রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে চলেছিল। তারপরই পাহাড়ের মাথায় একটা লম্বা রোগা লোকের আবির্ভাব ঘটল। দূর থেকে এটুকুই দেখতে পেলাম—লোকটা ঘোড়ার দিকে এগোতেই, ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। জোহান আর তাদের ধরে রাখতে পারল না। তারা তীরবেগে ছুট দিল পথ ধরে। দেখলাম, তারা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল। আগন্তকের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, সেও ততক্ষণে চলে গিয়েছে।

জোহান যে নিচু উপত্যকায় যেতে আপত্তি করছিল, পথ ধরে তার দিকেই চললুম নিশ্চিত মনে। জোহানের আপত্তির কোনো কারণই খুঁজে পেলুম না। কয়েকঘণ্টা ঘোরাঘুরি করলুম। কত সময় বয়ে গেল, কত দূর এলুম—এসবের খেয়াল রইল না। তবে বাড়ি বা লোকজন কিছু চোখে পড়ল না। কেমন নির্জন পরিত্যক্ত গোছের জায়গা। এই ব্যাপারটা আগে খেয়াল হয়নি। রাস্তার বাঁকে এসে কয়েকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঠের বাড়ির ধ্বংসস্তুপ দেখে বুঝলাম যে আমাকে যা মুগ্ধ করছিল, তা এই জায়গাটার পরিত্যক্ত রূপটি ছাড়া আর কিছুই না।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে চারপাশটা একবার দেখে নিলুম। মনে হল, হাঁটা শুরুর আগে যতটা ঠান্ডা ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা তখন বোধ হচ্ছে। একটা ফিসফিসানি শব্দ আমার চারপাশে মাঝেমাঝেই শোনা যাচ্ছিল। মাথার উপরেও কেমন একটা হালকা গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। উপরে তাকিয়ে দেখি, বিরাট ঘন মেঘ দ্রুত উত্তর থেকে দক্ষিণে আকাশে ছেয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। ঠান্ডা লাগছিল। ভাবলাম, বসে থাকা ঠিক হবে না। তাই আবার চলতে শুরু করলুম।

এবার যে জায়গাটায় এলুম, সেটা ভারি সুন্দর। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু যদিও ছিল না। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা সৌন্দর্যের ভাব ছিল। সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না। এদিকে গোধূলির আলো ক্ষীণ হয়ে এলে মনে হল, এবার পথ খুঁজে বাড়ি ফিরি কি করে? বাতাস ঠান্ডা। মাথার উপর মেঘও ঘনীভূত হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে গম্ভীর মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে। যে গর্জনকে ভেদ করে আবার মধ্যে মধ্যে রহস্যজনক এক চিৎকার শোনা যাচ্ছে—যেটাকে ড্রাইভার বলেছিল নেকড়ের চিৎকার। খানিক ইতস্তত করলাম। আসার পথে একটা পরিত্যক্ত গ্রাম দেখেছিলাম। সেদিকেই হাঁটা দিলাম। উপস্থিত হলাম একটা খোলা প্রান্তরে। চারদিকে তার পাহাড় দিয়ে ঘেরা। গাছে ঢাকা প্রান্তভাগ নেমে গিয়েছে সমভূমির দিকে। তবে ঢাল কম। এখানে সেখানে ঝোপঝাড় আর গর্ত। একটা রাস্তা দেখলাম ঐক্যেঁকে একটা ঘন ঝোপের দিকে এগিয়ে গেছে, তারপর তার পিছনে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় কনকনে ঠান্ডা বাতাস লাগল গায়ে। বরফ পড়া শুরু হল। মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ। কাছেই কোনো কাঠের স্তূপে আশ্রয় নিতে গেলুম। এদিকে আকাশ কালো হয়ে এল। মুষলধারে বরফ পড়া শুরু হল। দেখতে দেখতে আমার চারপাশে সাদা গালচে বিছিয়ে গেল, তার শেষ কোথায় দেখতে পেলুম না। পথের ধারগুলো ঠিক চিহ্ন দেওয়া ছিল না। তাই সেটাও আর দেখতে পেলুম না। খানিক বাদেই পায়ের তলায় ঘাস আর শ্যাওলার স্পর্শে বুঝলুম, পথ থেকে সরে এসেছি। বাতাসের গতি জোর হল। তার বিরুদ্ধে হাঁটাও কষ্টকর হল। সেই বাতাস আবার হিমশীতল। হেঁটেও ঠান্ডার কাঁপুনি থেকে রেহাই পেলুম না। এত জোরে বরফ পড়ছিল যে চোখ খোলা রাখাও দুষ্কর হল। মাঝে মধ্যেই

আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেই আলোয় দেখলুম আমার সামনে শুধু ইউ আর সাইপ্রাসের তুষারাবৃত ঘন জঙ্গল।

শিগগিরই আশ্রয় নিলাম সেই গাছের ছায়ায়। জায়গাটা তুলনামূলকভাবে নিঃসুর। মাথার অনেক উপরে বায়ুর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। ঝড়ের অন্ধকার তখন মিশে গিয়েছিল রাতের অন্ধকারে। তারপর এক সময় ঝড় থেমে গেল। শুধু মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া বইতে লাগল। এই অবস্থায় সেই নেকড়ের অদ্ভুত শব্দটা আমার চারপাশের নানা শব্দের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

মাঝেমাঝে ভাসমান কালো মেঘের ফাঁক গলে একটু আধটু জ্যোৎস্না গলে পড়ছিল। সেই আলোয় দেখলুম, আমি সেই গভীর সাইপ্রাস আর ইউ গাছের বনের শেষভাগে এসে দাঁড়িয়েছি। বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলুম। চারপাশটা ভাল করে ঘুরে দেখলুম। মনে হল, যে সব ভগ্নস্তুপ পেরিয়ে এসেছি, তার মধ্যে একটা বাড়ি রয়েছে যেখানে আমি খানিকের জন্য আশ্রয় নিলেও নিতে পারব। যদিও সেই বাড়িটাও ভাঙাই। ঝোপের ধারে আসতেই দেখি একটি নিচু পাঁচিল সেটাকে ঘিরে আছে। তারপরে খানিকটা খোলা জায়গা। এখানে একটা সরু পথ চলে গিয়েছে একটা চৌকো বাড়ির মতো স্থাপনার দিকে। পথটা আসলে সাইপ্রাস-বীথি। বাড়ির মতো জিনিসটা দেখার পরই আবার মেঘ এসে চাঁদকে আড়াল করে দিল। আমি অন্ধকারেই পথটা পেরিয়ে এলুম। হাওয়া বোধহয় আরও ঠান্ডা হয়ে আসছিল। কাঁপতে কাঁপতে হাঁটতে লাগলুম। আশ্রয়ের আশায় কোনোক্রমে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলুম।

সেখানে কেমন একটা হঠাৎ-সুস্পষ্ট অনুভূত হল। দাঁড়িয়ে পড়লুম। এদিকে ঝড় থেমে গেছে। সম্ভবত প্রকৃতির সুস্পষ্টতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমার বুকের ধুকপুকুনিও থেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা সাময়িক। হঠাৎ চাঁদের আলো ফুটে উঠল। দেখলাম, আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা কবরখানায়। আমার সামনে ওই চৌকো বস্তুটা আসলে একটা বিরাট শ্বেতপাথরের সমাধিসৌধ। তার চারপাশের মাটিও বরফে বরফে সাদা। চাঁদের আলোর সঙ্গে বয়ে এল ঝোড়ো বাতাসের ফিসফিসানি একটা শব্দ। যেন অনেকগুলি কুকুর বা নেকড়ে একসঙ্গে চিৎকার করছিল। ভয় পেয়ে গেলুম। সারা শরীরে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। শ্বেতপাথরের উপর পড়েছিল চাঁদের আলো। এমন সময় নতুন করে ঝড় ওঠার তোড়জোড় শুরু হল। মোহমুগ্ধের মতো এগিয়ে

গেল সমাধিফলকটির দিকে। ওটা কি, কেন এভাবে একা এখানে দাঁড়িয়ে—তা জানার আগ্রহ জাগল। চারদিকে ঘুরে ডোরিক তোরণটার উপর দেখি জার্মানে লেখা—

কাউন্টেস ডোলিনজেন অফ গ্রাটজ

স্টাইরিয়া-তে

অনুসন্ধান করে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়

১৮০১

সমাধিসৌধের উপর পাথরের চাঙড় ভেদ করে উঠেছে একটা বড়ো লোহার বর্শা বা শূল। পিছনে গিয়ে দেখি রাশিয়ান হরফে বড়ো বড়ো করে লেখা রয়েছে: “মৃতেরা ভ্রমণ করে দ্রুত।”

একটা গা-ছমছমে অনুভূতি হল। হাত পা অবশ হয়ে এল। প্রথম বার মনে হল, জোহানের কথা শুনলেই ভাল করতুম। আরও একটা ভাবনা আমার মনে উদয় হল—কথাটা মনে এল নাটকীয়ভাবে আর একটা নাড়া দিয়ে গেল মনটাকে—আজ ওয়ালপারজিস রাত্রি!

লক্ষ লক্ষ লোক মনে করে, ওয়ালপারজিস রাত হল সেই রাত, যে রাতে শয়তান ঘুরে বেড়ায় বাইরে—যে রাতে কবরের ঢাকা যায় খুলে; মৃতেরা উঠে এসে হেঁটে চলে বেড়ায়। যে রাতে জলে স্থলে আকাশে সর্বত্রই সব কিছুর উল্লাস শুরু হয়। ড্রাইভার এখানে এসেই ভয়ে পেয়েছিল। এই সেই গ্রাম যেটি বহু শতাব্দী আগে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এখানে লোকে আত্মহত্যা করেছিল। এমন এক জায়গায় আমি একা, সম্পূর্ণ একা। তার উপর মাথার উপর দানা বাঁধছে ঝড় আর আমি কাঁপছি বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আমার পড়া সব দর্শন, ধর্মশিক্ষা আর সাহস একত্রিত করে দাঁড়ালাম, যাতে ভয়ে অজ্ঞান না হয়ে যাই।

তারপরই এক মহাঝড় আছড়ে পড়ল আমার উপর। মাটি কেঁপে উঠল। যেন হাজারে হাজারে পাগলা ঘোড়া ছুটে বেরিয়ে গেল। এবার আর বরফ নয়, ঝড় তার হিমশীতল ডানায় বয়ে আনল শিলাবৃষ্টি—ভয়ানক এক শিলাবৃষ্টি।

সাইপ্রাসের গাছগুলো দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু তার পাতা আর ডাল ভেদ করে পড়তে লাগল শিল। একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলুম। কিন্তু গাছের তলায় দাঁড়ানো নিরাপদ বোধ হল না। তখন ভরসা শুধু সেই শ্বেতপাথরের সমাধিমন্দিরের ডোরিক তোরণটি। সেই বিশাল ব্রোঞ্জের দরজায় হেলান দিয়ে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেলুম। শিল পড়তে লাগল আমার চারপাশের পাথরে।

দরজায় হেলান দিয়েছিলুম বলে সেটা পিছন দিকে খুলে গেল। এই নির্দয় ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পেতে তখন কবরের আশ্রয়ই সই। সেখানেই ঢুকতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় প্রচণ্ড জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল—সেই আলোয় দেখলুম সমাধিগৃহের অন্ধকারে এক সুন্দরী নারী শায়িত, তার গালদুটি সুডৌল, ঠোঁটদুটি লাল। মনে হল সে বেদির উপর কফিনে শায়িত। চমকে উঠলুম। মাথার উপর আকাশ গর্জে উঠল। যেন দুটো দৈত্যের হাত আমাকে টেনে বাইরে বের করে আনল ঝড়ের মধ্যে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিলাবৃষ্টির আঘাতে পড়ে গেলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন জানি মনে হতে লাগল যে আমি একা নই। সমাধিসৌধটার দিকে তাকালুম। সৌধের মাথার উপর শ্বেতপাথর ফুঁড়ে যে লৌহফলকটা উঠেছিল, তার উপর বাজ পড়ল। সমাধিসৌধটার পাথর ফেটে তাতে আগুন লেগে গেল। মৃত রমণীটি এক মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার ডুবে গেল ঝড়ের গর্জনে। শেষ যে শব্দটা শুনলাম, তা অনেকগুলো ভয়ংকর শব্দের মিশ্রণ। আবার কোনো দৈত্যের হাত আমাকে ধরে টেনে নিয়ে চলল। আমার উপর শিল পড়তে লাগল। চারদিক থেকে নেকড়ের গর্জন শোনা যেতে লাগল। শেষ যা দেখলাম, মনে আছে, একটা অস্পষ্ট, সাদা, চলমান পুঞ্জ। মনে হল আমার চারপাশের কবরখানা তার সব মৃতের প্রেতাত্মাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। আর তারা যেন সেই শিলাবৃষ্টির সাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

একটুখানি হুঁশ ফিরতেই ভয়ে কঁকড়ে গেলুম। খানিকক্ষণের জন্য আবার জ্ঞান হারালুম, আবার একবার ফিরে এল চেতনা। পায়ে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হল, নড়তে পারলুম না; মনে হল পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে। ঘাড়ে একটা হিমশীতল স্পর্শ টের পেলুম, শীতল ভাবটা আমার শিরদাঁড়া ধরে নেমে এল। পায়ের মতো কানদুটোও অসাড় হয়ে এসেছিল যন্ত্রণায়। শুধু বুকের কাছে

একটা গরম ভাব পাচ্ছিলাম, যাতে তুলনামূলকভাবে একটু আরাম পাচ্ছিলুম। পুরো ব্যাপারটাই মনে হল দুঃস্বপ্ন-শারীরিক দুঃস্বপ্ন। মনে হল, আমার বুকের উপর এমন কিছু চেপেছে, যাতে করে আমার নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে।

এই অধ্বীচৈতন্যাবস্থা স্থায়ী ছিল অনেকক্ষণ। সেটা কেটে গেলে মনে হল আমি বোধহয় ঘুমাচ্ছিলাম। তারপর একটা গা-বমি ভাব এল-কতকটা সিসিকেনেসের প্রথম ধাপের মতো। নিজেকে কিছুর থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রবল বাসনা দেখা দিল-কিন্তু কিসের থেকে সেটাই বুঝলুম না। এক প্রকাণ্ড স্থবিরতা গ্রাস করল আমাকে। মনে হল, সারা পৃথিবীটা হয় ঘুমাচ্ছে, নয় মরে গেছে-শুধু আমার কাছে বসে থাকা কতকগুলো জানোয়ারের নিঃশ্বাসের আওয়াজ সেই নৈঃশব্দের ব্যাঘাত ঘটছে। গলার কাছে একটা উষ্ণ বিচ্ছিরি শব্দ পেলুম, তারপর ব্যাপারটা টের পেলুম; সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদপিণ্ডটা ঠান্ডা হয়ে এল ভয়ে। একটা বিরাট জন্তু আমার উপর শুয়ে আমার গলাটা চাটছিল। ভয়ে নড়তে পারলাম না। আমার সহজাত প্রবৃত্তি আমাকে চুপটি করে পড়ে থাকতে বলল। কিন্তু মনে হল, জন্তুটা আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন টের এল। সে তার মাথা তুলল। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, আমার উপর এক দৈত্যাকার নেকড়ের দুটো বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করছে। তার ফাঁক হয়ে থাকা বিরাট মুখের মধ্যে চকচক করছে ধারালো সাদা দাঁত। তার গরম জান্তব ক্ষুরধার নিঃশ্বাস এসে পড়ছে আমার উপর।

তারপর আবার খানিকক্ষণ কিছু মনে ছিল না। তারপর একটা নিচু গলায় গোঙানির আওয়াজ শুনে হুঁশ ফিরল। খানিকবাদে একটা কুকুরের কান্নার মতো আওয়াজ শুনলাম। বারবার নতুন করে আওয়াজটা উঠতে লাগল। তারপর অনেক দূর থেকে অনেক মানুষের গলায় একটা “Holloa! holloa!” আওয়াজ শুনতে পেলুম। সাবধানে মাথা তুলে যদিও থেকে আওয়াজটা আসছিল, সেদিকে তাকালুম। কিন্তু কবরখানাটা আমার দৃষ্টিপথের বাধা হতে লাগল। এদিকে নেকড়েটা অদ্ভুতভাবে ডেকেই চলল। তার লাল দৃষ্টি ঘুরে গেল সাইপ্রাসের ঝাড়ের দিকে; যদিও থেকে আওয়াজটা আসছিল, সেই দিকে। কণ্ঠস্বরগুলো কাছাকাছি আসতেই নেকড়ের গর্জনও তীব্র হয়ে উঠল। ভয়ে চুপ করে কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। আমার চারপাশের অন্ধকারের সাদা আস্তরণের উপর একটা লাল আলোর আভাস দেখতে পেলুম। তারপর হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে একদল মশালধারী অশ্বারোহী বেরিয়ে এল। এইবার

নেকড়েটা আমার বুকের উপর থেকে উঠে কবরখানার পথ ধরল। একজন অশ্বারোহী (তার টুপি ও লম্বা সামরিক পোষাক দেখে তাকে জওয়ান বলে চিনলুম) নিজের কারবাইন তুলে তাক করল। তার এক সঙ্গী তার হাতটা সরিয়ে দিল। শুনলাম মাথার উপর দিয়ে বুলেটটা হুস শব্দ করে বেরিয়ে গেল। আগের লোকটা বোধকরি আমার শরীরটাকে নেকড়ের শরীর বলে ভুল করেছিল। আরেকজন জানোয়ারটাকে পালাতে দেখে গুলি চালাল। তারপর ঘোড়ার টগবগ শুনলুম। অশ্বারোহীর দল এগিয়ে এল—একদল এল আমার দিকে, অপর দলটা তুষারাবৃত সাইপ্রাস বনে নেকড়েটার পিছনে ধাওয়া করল।

তারা কাছে আসতে আমি উঠতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু শরীরে বল ছিল না। যদিও আমার চারপাশে কী চলছিল, সবটাই দেখতে— শুনতে পাচ্ছিলুম। দু-তিনজন জওয়ান তার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে আমাকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসল। তাঁদের একজন আমার মাথাটা তুলে নিজের হাতটা আমার বুকের উপর রাখলেন।

তারপর চেষ্টা করে উঠে বললেন, “সব ঠিক আছে, বন্ধুরা! উনি বেঁচে আছেন!”

আমার গলায় খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে দেওয়া হল। তাতে খানিকটা বল পেলুম। এবার চোখ খুলে তাকালুম। চারদিকটা দেখলুম। গাছের আড়ালে আলোছায়া খেলা করছিল। শুনলাম, সবাইকে ডাক দেওয়া হল। সব তাড়াতাড়ি কবরখানা থেকে বেরিয়ে এল। সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক। যে লোকগুলো আমার কাছে বসেছিল, তারা জিজ্ঞাসা করল, “তাকে পেলো?”

জবাবে সবাই একবাক্যে বলে উঠল, “না! না! এখুনি চলে আসুন, শিগগির-শিগগির! এখানে থাকা নিরাপদ নয়, আর আজকের রাত্তিরটাও ভাল না!”

তারপর সবাই নানা ভাবে যে প্রশ্নটা করল, সেটা হল, “ওটা কী?” উত্তরটাও এল নানা ভাবে। মনে হল, সবাই একটা কিছু দেখে ভয় পেয়েছে—সেই ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়েই কথা বলছে।

“ওটা... ওটা... ওটা হল গিয়ে... ইয়ে...!” একজন বিড়বিড় করে কী বলতে গেল, কিন্তু কোনো কথা খুঁজে পেল না।

“নেকড়ে-আবার নেকড়ে নয়!” আর একজন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

তৃতীয়জন সাদামাটাভাবে বলল, “পবিত্র বুলেট ছাড়া তাকে মারার চেষ্টা করা বৃথা।”

চতুর্থ জন বললে, “আজ রাতে যেটুকু করতে পেরেছি তাই অনেক-আমাদের মোটা ইনাম দেওয়া উচিত!”

আর একজন বললে, “ভাঙা শ্বেতপাথরে রক্ত দেখলুম। নিশ্চয়ই বাজ পড়ে ওখানে রক্ত আসেনি। আর উনি-উনি কী নিরাপদ? ওঁর গলাটা দেখুন! বন্ধুরা দ্যাখো, নেকড়েটা ওঁর বুকের উপর বসে ওঁর রক্তকে গরম রেখেছিল।”

অফিসার আমার গলা পরীক্ষা করে উত্তর দিলেন, “উনি ঠিক আছেন, চামড়ায় ফুটো নেই। কিন্তু এর মানে কী? ওই নেকড়েটা চিৎকার না করলে আমরা ওঁকে খুঁজেও পেতাম না।”

“ওটার কী হল?” যে লোকটি আমার মাথা ধরেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ঐকে ততটা ভীত মনে হল না-তাঁর হাত শক্ত ছিল, কাঁপুনির কোনো লক্ষণ দেখা দেয়নি। তার স্নিভে দেখলাম জুনিয়র অফিসারের শেভরন।

একটা লোক তার ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বলল, “ওটা ঘরে ফিরে গেছে। এখানে ওর শোয়ার জন্য অনেক কবর রয়েছে। চলে এসো, বন্ধুরা-শিগগির! এই জায়গাটা অভিশপ্ত!”

অফিসারটি আমাকে বসালেন। তারপর তাঁর আদেশে কয়েকজন এসে আমাকে ধরে ধরে একটা ঘোড়ার উপর বসালো। তিনি আমার পিছনে বসে আমাকে ধরে রইলেন। এগোনোর নির্দেশ দিলেন। সাইপ্রাস বন ছাড়িয়ে আমরা সামরিক ছন্দে এগোতে শুরু করলুম।

কথা বলতে পারছিলুম না বলে চুপ করে রইলুম। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি আমি দুপাশে দুজন জওয়ানের কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে আছি। দিনের আলো ফুটে উঠেছে। বরফের অবশেষের উপর

উত্তরের পথে রোদের আলো পড়ে পথটাকে রক্ত-রাঙা মনে হচ্ছে। অফিসারটি লোকেদের বলছেন, যা দেখেছো, সে সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে হবে না, শুধু বলবে একজন আগন্তুক ইংরেজকে খুঁজে পেয়েছো, একটা কুকুর তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

ভয়- পাওয়ার দলের একজন বলে উঠল, “কুকুর! ওটা কুকুর নাকি? আমি জানি-নেকড়ে চিনি না?!”

তরুণ অফিসারটি শান্তভাবে বললেন, “আমি বলছি, ওটা কুকুর।”

দিনের আলো দেখে লোকটির হারানো সাহস ফিরে আসছিল, সে ব্যঙ্গভরে বলল, “কুকুর! দেখুন ওঁর গলাটা, ওটা কি কুকুরের কাজ, কর্তা?”

কথাটা শুনে গলায় হাত দিলুম, ছুঁতেই ব্যথায় চিৎকার করে উঠলুম। সবাই পিছন ফিরে তাকাল। কেউ কেউ ঘোড়া থেকে নেমে এল। তরুণ অফিসারটি আবার শান্ত গলায় বললেন, “আমি বলছি, কুকুর। অন্য কিছু বললে, লোকে আমাদের কথা শুনে হাসবে।”

তারপর এক জওয়ানের পিছনে ঘোড়ায় উঠে পড়লুম। এগিয়ে চললুম মিউনিখের শহরতলির পথ ধরে। এখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল। তাতে উঠে আমার হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। তরুণ অফিসারটি আমার সঙ্গে চললেন। একজন জওয়ান ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অনুসরণ করল। অন্যেরা ব্যারাকে ফিরে গেল।

আমরা ফিরতেই হের ডেলব্রুক ছুটে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। মনে হল, উনি আমাদের পথ চেয়েই ছিলেন। আমার দুই হাত ধরে তিনি আমাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। অফিসারটি আমাকে স্যাঁলুট ঠুকে বিদায় নিতে চাইলেন। ব্যাপার বুঝে তাঁকে আমার কামরায় আমন্ত্রণ জানালুম। এক গ্লাস পানীয় দিয়ে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানালুম। তিনি শুধু বললেন, হের ডেলব্রুক প্রথমেই খোঁজ-পার্টি নিয়োগ করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। হোটেল-মালিক এই কথায় একটু হাসলেন মাত্র। তারপর অফিসারটি ডিউটির কথা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “কিন্তু, হের ডেলব্রুক, আপনি কেমন করেই বা আর কেনই বা আমাকে খোঁজার জন্য ওই জওয়ানদের নিয়োগ করলেন?”

তিনি কাঁধ নাচিয়ে নিজের কাজটা একটু খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করলেন, বললেন, “আমি যে রেজিমেণ্টে আছি তার কম্যান্ডারের কাছে কিছু স্বেচ্ছাসেবক চেয়েছিলাম। ওঁর সহায়তা ভুলব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “কিন্তু আমি যে হারিয়ে গেছি, সেকথা আপনি জানলেন কী করে?”

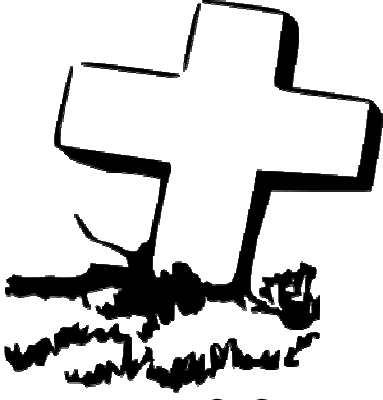
“আরে মশাই, ঘোড়াগুলো পালিয়ে গেল। ড্রাইভার অনেক কষ্টে ভাঙা গাড়িটা নিয়ে ফিরে এল।”

“কিন্তু সেজন্য নিশ্চয়ই আপনি আমার জন্য সামরিক খোঁজ-পাঠি পাঠাননি?”

“ওহো, না!” তিনি জবাব দিলেন, “কিন্তু কোচোয়ান ফিরে আসার আগে, আপনি যে বোয়ারের অতিথি, তাঁর থেকে একটা টেলিগ্রাম পাই।” উনি পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে আমার হাতে দিলেন। পড়ে দেখলুম:

বিস্ত্রিজ। আমার অতিথি সম্পর্কে সাবধান—তাঁর সুরক্ষা আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। তাঁর কিছু হলে, তিনি হারিয়ে গেলে, তাঁকে খোঁজার জন্য সব কিছু করবেন। তাঁর সুরক্ষার সবরকম ব্যবস্থা করবেন। তিনি ইংরেজ, এবং সেই জন্য একটু অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। বরফ, নেকড়ে আর রাত খুব বিপজ্জনক। তাঁর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে, সময় নষ্ট করবেন না। খরচপত্র নিয়ে ভাববেন না, ওটা আমি দেখব। —ড্রাকুলা।

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে আমার মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগল। হোটেল-মালিক আমাকে না ধরলে বোধহয় পড়েই যেতুম। পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত আর অকল্পনীয় মনে হল। আমার এই অস্তিত্ব যেন আমার বিরুদ্ধ শক্তির এক খেলা মাত্র—কথাটা ভেবেই আমার হাত-পা অবশ্য হয়ে এল। নিশ্চয় কোনো রহস্যময় রক্ষাকবচ ঘিরে ছিল আমাকে। নয়তো তুষার আর নেকড়ের মুখ থেকে আমাকে রক্ষা করতে বহু দূরের এক দেশ থেকে একেবারে সঠিক সময় এমন বার্তা কীভাবে এল!



ড্রাকুলার অতিথি

মূল রচনা: ব্রাম স্টোকার

অনুবাদ: অর্ণব দত্ত

মূল রচনাটি স্বত্বমুক্ত। তবে এই অনুবাদের অনুবাদস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। অনুবাদের অনুমতি ও নাম- উল্লেখ ছাড়া তা কোনো উপায়ে অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

© অর্ণব দত্ত

এই বিশেষ পিডিএফ- সংস্করণটি প্রকাশের তারিখ: ৮ নভেম্বর, ২০১২

—প্রকাশ ও পরিবেশনায়—

বঙ্গভারতী

কলকাতা